দুর্গাপুজো—এক থেকে অন্যরূপ

ড. দেবলীনা দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপিকা
লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অকালে যে পুজো, তাই অকাল বোধন । শ্রীশ্রী চন্ডীতে বর্ণিত আছে মেধস ঋষির আশ্রমে আগত রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে দেবীতত্ত্ব বর্ণনার পর মুনিবর দেবীপুজোর আদেশ দেন, ঋষির আদেশে দেবীমূর্তি নির্মাণ করে পূজা সম্পন্ন হয়, বর্তমানে এই পূজা বাসন্তীপূজা নামে পরিচিত। উপনিষদের পাতাতেও আমরা শক্তিপূজার উল্লেখ পেয়েছি। বর্তমানে আশ্বিনের শারদ প্রাতে যে শারদার আরাধনা করি, তা দশরথপুত্র রামচন্দ্রের অনুসরণে অকাল বোধন। এই পুজো মহিষাসুর মর্দিনীর পুজো। এই দেবী মহামায়া, কাত্যায়নী, দুর্গা। দেবীভাগবত, মার্কন্ডেয়চন্ডী, কালিকাপুরাণে দেবী দুর্গা এইভাবেই পূজিতা। বাঙালি শুধু পূজার্চ্চনার ডালি এই শরৎশুভ্র আবাহন লগ্নে সাজায় না, তার শ্রেষ্ঠ উৎসবটিকে পালন করে পরম যত্নে, পরম মমতায়। দেবীর রূপভাবনা থেকে শুরু করে পুজোর প্রতিটি আঙ্গিকে ধরা থাকে বাঙালিয়ানা। সমগ্র বাঙালির যেন ঘরের মেয়ে দুর্গা। ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে সব বাঙালির সর্বাঙ্গে মিশে আছেন মা দুর্গা। দুর্গার মধ্যে আমরা প্রত্যেক মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। বঙ্গদেশের দুর্গাপুজোর সাথে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। দুর্গা আমাদের ঘরোয়া দেবী, যাকে নিয়ে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব। শাক্ত সাধনায় মানবীয় স্নেহ দুর্গাপুজোতেই লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির মনে দুর্গা সপরিবারে গৃহস্থ রূপেই বিরাজিতা। একসময় ইনি ছিলেন বনদুর্গা, পর্বতবাসিনী, পাতার আব্রুতে হ'লেন পর্ণশবরী। পৌরাণিক দুর্গা বাংলার মাটিতে এসে লোকায়ত চিত্র পেয়েছেন। শরতের এই দুর্গোৎসবের অন্তরালে আছে কৃষি উৎসবের নির্যাস। প্রাক্‌কৃষিপর্বে দুর্গা ছিলেন জনজাতির ঘেরাটোপে, অরণ্যচারী বনদুর্গার পুজো করা হত 'শেওড়াগাছকে'। মেয়েরা এই বনদুর্গার ব্রত পালন করত মানুষ ও দেবতার সখ্যতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ওপার বাংলার গ্রাম-গঞ্জে আজও পৌষসংক্রান্তিতে কোথাও বা বৈশাখমাসে বনদুর্গার পুজোর প্রচলন আছে। এর মূর্তি বিরল। বঙ্গদেশে কুষ্ঠরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য রা'ল দুর্গার ব্রত উদযাপন করে সধবারা। মূর্তিহীনা আর এক দুর্গাও বাংলাদেশে অনাড়ম্বর ভাবে পূজিতা—শুভদুর্গা। সামান্য উপাচারেই তিনি তুষ্টহন। উত্তরবঙ্গে দ্বিভুজা, ব্যাঘ্রবাহিনী ভান্ডারনী পুজোর প্রচলন আছে যাঁকে দুর্গারই আর একরূপ মনে করা হয়।

পুরাণকারেদের কাছেও দেবী শস্যদেবী ব'লেই পরিচিতা, দেবীর নামকরণও হ'য়েছে 'শাকম্ভরী'। সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশণও বলছে এক দেবীর শস্যদায়িনী রূপ। দুর্গার দশ হাতে পাতা ও গাছের বিভিন্ন অংশের উল্লেখও আছে। দুর্গাপুজোর অন্য একটি অঙ্গ নবপত্রিকার পুজো। কচু, হরিদ্রা, মানকচু, জয়ন্তী বেল, দাড়িম্ব, ধান ও অশোক গাছের পুজো অর্থাৎ নবপত্রিকার পুজো দেবীর আরণ্যক জীবনেরই পরিচায়ক। সপরিবারে দুর্গার যে বাহনদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় পেঁচা, সাপ, ময়ূর, ইঁদুর, হাঁস, বাঘের বা সিংহের উল্লেখ জনজাতির Totem কেই সূচিত করে। শিকার ও কৃষি ব্যবস্থার সমন্বয়ক রূপ ফুটে ওঠে দুর্গাপুজোর মধ্যে।

পরবর্তীতে বহুবিচিত্র কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে দুর্গার নানারূপ, দশমহাবিদ্যা ও আরও নানারূপ। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রে এক এক গোষ্ঠীর ছিল একএকরকম Totem ভাবনা। এক একটি গোষ্ঠী

নিজেদের সেই প্রাণীর বংশধর ব'লে মনে করত, আজও জনজাতিদের মধ্যে এই বিশ্বাস বিদ্যমান। এই একটি ক'রে পশুকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল Cult, লৌকিক ধারণা অনুযায়ী বাঘের পিঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্যাঘ্রদেবী সিংহারূঢ়া হলেন সিংহবাহিনী তেমনি মহিষের পিঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবীও ছিলেন। বিভিন্ন সীলমোহরেও এইরকম চিত্র পাওয়া গেছে। সীলমোহরের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে দুই বা ততোধিক Cult এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগেই থাকত। তারই ফলস্বরূপ মহিষ ও ব্যাঘ্র Cult এর সংঘর্ষও অসম্ভব কিছু ছিল না। এই সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের সূত্রেই ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পরিণত হওয়া বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। শিল্প, সাহিত্য, ধর্মাচরণে বাঘকে সরিয়ে জায়গা ক'রে নিল সিংহ। নতুন সাংস্কৃতিক ধারায় সমাজের নীচের তলায়, অবহেলায়, অবজ্ঞার শিকার হলেন ব্যাঘ্র Cult এবং তার বাহকেরা, ওপরতলার সমাজে জায়গা করে নিল সিংহ Cult এবং তার ধারকগণ। দুর্গার রূপের একের পর এক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক স্তরবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘ'টেছে দেবীরূপে, কিন্তু নতুনের আড়ালে কোথাও র'য়ে গেছে পুরনোর ছায়া। দুর্গাপুজোর কুমারী পুজোও উর্বরতা তন্ত্রেরই একটি প্রতীক। মধ্যযুগে ভূস্বামীদের শক্তি আরাধনা এক নতুন অভিব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল। বাঙালির যৌথপরিবার ভিত্তিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটল সপরিবারে দেবীর আগমনে।

বাংলাদেশে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন রাজা কংসনারায়ন। বিখ্যাত তান্ত্রিক শ্রী রমেশ শাস্ত্রী ছিলেন তার কুলপুরোহিত, আধুনিক দুর্গোৎসবের চিন্তা তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। এই পুজোর জাঁকজমকে মুগ্ধ হ'য়েছিল জনসাধারণ। এই পুজোতে তখনকারদিনে ব্যয় হয়েচিল প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার এবং জাহাঙ্গীরের সুবেদাররাও জাঁকজমক পূর্ণ দুর্গাপুজোর পৃষ্ঠপোষকতা ক'রেছিলেন। তারওপরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁও হিন্দু অভিজাতবর্গের দুর্গাপুজোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বণিকের মানদন্ড, রাজদন্ডরূপে দেখা দেওয়ার পর পট পরিবর্তন হ'ল। যারা একসময় ইংরেজবিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তারাই বিদেশী শক্তির শরণাপন্ন হলেন। ইংরেজ তোষণ দেশীয় রাজাদের এতটাই তীব্র ছিল, তার একটা দৃষ্টান্ত হ'ল ক্লাইভের বিজয় উপলক্ষ্যে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বিরাট ধুম ধাম করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন, যেখানে নর্তকীর আসর ও সুরাপানে যা অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তা গল্প গাথা। আসলে পুরাণ যাই বলুক না কেন, দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় যতই ব্রহ্মাণত্ব আরোপিত হ'ক না কেন, আসলে জমিদারী কায়েম রাখতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ব'লে চালানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল, দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের আড়ালে। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাকে আমরা বাঙালি ঘরের মেয়ে হিসেবেই দেখতে ভালোবাসি। বিয়ের পর মেয়ে যেমন শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার সময় পায় না, মায়ের হৃদয় তাতে উদ্বেলিত হয়। বাঙালি মায়ের এ এক চিরন্তন রূপ। ঠিক তেমনি দীর্ঘদিনের অর্দশনে হিমালয় কন্যা উমার মা, মেনকার মনও আকুল, তিনি গিরিরাজকে বলছেন—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী মা আমার কত কেঁদেছে'। বাঙালি কন্যা, তাই আপামর বাঙালি অপেক্ষায় থাকে কবে তিনি বাংলার মাটিতে পা রাখবেন। আসলে বাঙালি দুর্গাকে মেয়েরূপে দেখতে ভালোবাসে, তাই দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনীরূপ দেশে তারা আপন করতে পারেনা। তাই দাশরথি রায়ের আগমনী পদে শোনা যায়— "কে হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী/ সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?" ঘরোয়া উমার সাথে ভয়ঙ্করী, দশভুজা দুর্গার মিল খুঁজে পান না মা। বাঙালি সুখী পরিবার, মমতাময়ী মা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। তাই দুর্গামূর্তির সাথে তার চার সন্তানকে যুক্ত করা হল। চার ছেলেমেয়ের স্নেহপাশে বেঁধে তাকে ঘরোয়া ক'রে দিল পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। একসময় রাজা, জমিদার, ধনীরা দুর্গাপুজো করত বৈভব দেখানোর জন্য। গোবিন্দরাম মিত্র

থেকে শুরু করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুজোয় বিত্ত-বৈভবের প্রকাশ ছিল ঈর্ষনীয়। বাঙালির উৎসব উদযাপনের দুটো দিক আছে— একটা আচার-বিশ্বাস অন্যদিকটি বিনোদন। দুর্গাপুজোয় এই দুইদিকের উপস্থিতি আগেও ছিল, এখনো আছে। পুরনো কলকাতার ধনীদের মধ্যে অর্থব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলত দুর্গাপুজোকে ঘিরে। থাকত বাঈনাচ, সুরাপান, খাওয়া-দাওয়া। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গোৎসবে প্রথম বাঙ্গজী নাচের প্রচলন করেন, তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কলকাতার নব্য বাবুরা। হুতোমের নক্সায় জানা যায় উনিশ শতকের প্রথম দুর্গাপুজো ছিল রাজা রাজড়াদের, কিন্তু এই শতকের শেষে 'পুঁটে তিলিকেও প্রিতিমা আনতে দেখা যায়'। তখন থেকেই দুর্গোৎসবের চেহারাও বদলাতে থাকে, পুজোর আগে থেকেই জেলার প্রতিমা শিল্পী ও নানা পসরা নিয়ে ফেরিওয়ালারা দোরে দোরে ঘুরতেন। চতুর্থী থেকেই পুজোর সাজ সাজ রব। বাবুদের বাড়িতে পন্ডিত, বাঈয়ের দালাল, যাত্রাদলের অধিকারী সবাই হাজির। নব্যশিক্ষিত বাঙালি বাড়ির পুজোর মেজাজটা আবার আলাদা, সেখানে বন্ধু আপ্যায়নের বহরটা ছিল বেশি। একে একে কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, হাটখোলার দত্তবাড়ি, শোভাবাজার রাজবাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুর পুজো, খেলাতবাবুর বাড়ির পুজো, জানবাজারে পীতরাম মাড় বাড়ির পুজো, পোস্তার রাজবাড়ি, শ্রীমনিবাড়ির পুজো ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছিল। আজও এই পুজোগুলো লোকের মুখে মুখে ঘোরে। বিত্তবানের দুর্গাপুজো ক্রমশ রূপ নিল বারোয়ারী পুজোর। গুপ্তিপাড়ায় এর সূচনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাতেও চল ছিল বারোয়ারী পুজোর। বাবুদের পুজোর সাথে তাদের পুজোর তফাৎ চোখেই পড়ত। বারোয়ারী পুজোয় সাবেকিয়ানার বদলে থাকত কিছুটা বিলিতিছাপ। দুর্গোৎসবের কলকাতা যেমন এখনো অন্যমাত্রা ও রূপ পায়, তখনো পেত। কবিগান, বুলবুলির লড়াই, পাঁচালি, খেমটা সবকিছুই জায়গা করে নিত। নবমীতে বলিও হত প্রতিযোগিতার মাপকাঠি। বাড়ি বাড়ি ঠাকুর দেখা, প্রসাদবিতরণ চলত। সবার গায়ে উঠত নতুন জামা। দশমীতে দেবী বিদায়ের পালা। নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে, তোপ দেগে মহানন্দের সমাপন। হুতোমের কথায়— 'কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ্ খেলিয়ে বেড়াতে লাগলেন—আমুদে মিনসে ও ছোঁড়ারা নৌকোর ওপোর ঢোলের সঙ্গতে নাচ্তে লাগলো'। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শেষে ঘুমিয়ে পড়ত ক্লান্ত শহর। একসময় গ্রামের বাড়ির পুজোর ছিল আলাদা স্বাদ। ঘরোয়া মঙ্গলধ্বনিতে সেজে উঠত পুজোবাড়ি। গ্রামের কোনো একটি বাড়ির পুজোই রূপ নিত পাড়ার পুজো হিসেবে, সকলের অবারিত দ্বার সেখানে। তবে গ্রামের সেই নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তাও আর নেই। শহরের আড়ষ্ট সৌজন্য গ্রামেও থাবাও বসিয়েছে। পুজোয় একসময় শিল্পীরা পুজোর গান গাইতেন, বছরের শ্রেষ্ঠ কাজটাকে তারা তুলে রাখতেন পুজোর জন্য। বাঙালি সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল পুজোর গান। অসাধারণ সব গানে একটা বিরাট পরিসর তৈরি হত। পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে বাজত সেই সব গান। প্রযুক্তি বদল হল, দিন বদলালো, পুজোরগান হারাতে লাগল তার জৌলুস। শিল্পী আর শ্রোতার রসায়ন তেমন আর নেই। 'একজন গাইবে গলা খুলে আর একজন গাবে মনে'— সেদিন আর নেই। পুজোর গানের জন্য সেই অপেক্ষাটাই আর নেই। পুজোর বাংলা গানের স্মৃতিতে আজও আমাদের মন মেদুর। তাই হালফিলের গানের ফাঁকে কোনো প্যান্ডেল থেকে মাইকে ভেসে আসা স্বর্ণ যুগের গানের সুরে আজও স্মৃতিতে সিক্ত হই আমরা।

এখন দুর্গাপুজো মানেই fusion version, থিমের সমারোহ। শিল্পীদের সৃষ্টিতে অসামান্য সব ভাবনা। প্রতিমা ও প্যান্ডেল নির্মানে শিল্পীদের অসামান্য দক্ষতা স্তম্ভিত ক'রে দেয় দর্শকদের। বাঁশ ছাড়া কাঠ, কাপড়, মশলা, পাট, ঝিনুক, সুপুরির খোল, তুষ, সাবান, টিন, ডাল, পেরেক প্রভৃতি জিনিস অসামান্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিমা তৈরিতে। প্যান্ডেল তৈরিতেও পট, সরা, পাখা, ভাঁড়। এই শিল্পসৃষ্টি এমনই অসামান্য যে

মনে হয় ভাসান হবে কি ক'রে? অনেকসময় এইসব প্রতিমার পাশে ডামি প্রতিমা রাখা হয়, পুজো করার জন্য। Corporate house গুলো পুজোয় পুরস্কার চালু করার পর শুরু হয়েছে মা-এর লড়াই। কারপুজো কত বড়, কতভালো। বাংলার পুজো এখন একটা Art Exhibition ভাসানের দিন যে দুর্গাকে দেখে চোখে জল এসে যায়, তার মধ্যেই আছে সাবেকিয়ানা। তাই বাগবাজার, পার্কসার্কাস, একডা লিয়ার মা—কে প্রণাম করতে আগে যান বহু মানুষ। থিমের মাকে দেখে মনে হয় মাতৃরূপেণ সংস্থিতা কোথায়? প্রত্যেক শিল্পী প্রাণ দিয়ে নির্মাণ করছেন এই প্রতিমা, প্যান্ডেল। কিন্তু যথাযথ মাতৃ উপাসনার পরিবেশ সেখানে অনুপস্থিত। মায়ের সাবেকি অপর্থিব রূপেই আমাদের চোখ জুড়োক সেখানেই আমাদের মনের টান, প্রাণের আরাম।

বাংলার মাটি শাক্তপীঠ। দুর্গা শক্তির দেবী। বাংলার মানুষ দুর্গাকে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, আন্তরিকতায় হৃদয় দিয়ে ধারণ করেছে। মায়ের আসা-যাওয়ার বারের ওপর নির্ভর করে মায়ের বাহনে যাতায়াত। কখনো গজে, কখনো অশ্বে, কখনো নৌকা ও কখনো দোলায় গমনাগমন করেন মা। মা বিচিত্রময়ী তাই তার যাতায়াতের বাহনও বিচিত্র। দেবীর কৃপায় কখনো শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, কখনো মড়ক।

দেশের আজ বড়ই দুঃসময়। মার কিছুই অজানা নয়। মৃন্ময়ীমূর্তি আমাদের কাছে চিন্ময়ীরূপেই দেখা দেন। মানুষ বড় অসহায় আজ, অতিমারিক্লিষ্ট এই সময়ে আমরা বিপর্যস্ত। ধনী দরিদ্র, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, চাকুরে, ধর্মার্থী সকলেই আজ মায়ের পথ চেয়ে আছে। মা সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করবেন এই আশাতেই বুক বেঁধেছে সবাই। মা কখনো ভক্তদের হাসান, কখনো কাঁদান। কখনো দেন সুখ কখনো বা দুঃখ। মা কখনো হাস্যময়ী, কখনো ক্রুদ্ধ। মানুষ আজ রোগাক্রান্ত, এক অজানা অচেনা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা কেউ জানিনা এর শেষ কোথায়! সবকিছুরই একটা শেষ আছে, আমরাও আশাবাদী যে করুণাময়ী, আনন্দময়ী মা তার ভক্তদের ক্লেশ দূর করবেন। এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তাঁর আছে। আমরা অসীম আগ্রহ ও আশায় বসে আছি চারটি দিনের জন্য। মেয়েরা পা ধুইয়ে তার আবাহন করবে, চোখের জলে তাকে বিদায় জানাবে, তিনি তো বাঙালির ঘরের মেয়ে। আদিম আরণ্যক দেবী বহু শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় আজ বাঙালির ঘরের মেয়েতে রূপান্তরিতা। নানা বিবর্তনের মাঝে বাঙালী মানসলোকে মেয়ের বাপের বাড়িতে আসাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সপরিবারে তিনি আসুন মঙ্গলারূপিনী দেবী লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্ব্বাদ দিন সবাইকে এই শুধু প্রার্থনা।

সহায়ক গ্রন্থ:

পূজাপার্বনের উৎসকথা, পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০১।

লোকসংস্কৃতি গবেষণা, লোকশিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ সংখ্যা,
সম্পাদনা সনৎ কুমার মিত্র, পুস্তকবিপনি, কলকাতা ২০০০।

পত্র পত্রিকা:

সাপ্তাহিক বর্তমান, অগাষ্ট ২০০৮

সাপ্তাহিক বর্তমান, অক্টোবর ২০১১

সাপ্তাহিক বর্তমান, সেপ্টেম্বর ২০১৭

সাপ্তাহিক বর্তমান, সেপ্টেম্বর ২০১৯

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯